বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

ছড়ানো ছড়ায় অপরাজিতা রায়

ছড়ার রূপ-রস গঠন ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে। সমাজের বিবর্তনে মানুষের রূপ-সৌন্দর্য ও জীবনশৈলীর পরিবর্তন এবং অন্তর্নিহিত রূপের চিত্র উল্টে-পাল্টে দেখার কাজটাও ইদানিং ছড়ায় দেখা যাচ্ছে। ছেলেভুলানো ছড়ার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র, প্রেম-প্রকৃতি জীবন যাপন সবই ক্রমাগত চলে আসছে ছড়ানো ছড়ায়। অন্নদাশংকর রায় ছড়া বলতেন না , বলতেন ছড়া সাহিত্য। ছড়ার গভীরে গিয়ে ডুবুরীর মতো অনুসন্ধান না করলে অনেক ছড়ারই অর্ন্তনিহিত রস পাওয়া যাবেনা, পাওয়া যাবেনা তৎকালীন সমাজ জীবনের কথা। যে কোন সাহিত্য বেঁচে থাকে তার নন্দনের দিক ও গভীরতার জন্য। পাশাপাশি ছড়ার ছন্দ ও বিষয়ের গভীরে বিষয় থাকলে এবং তা যদি একপেশে না হয়ে সবার হয়ে যায় তখনই সেটা হয়ে যায় চিরকালীন। আপাতদৃষ্টিতে ছোটোদের সব ছন্দবদ্ধ লেখাকেই আমরা ছড়া যদি বলি তাহলে তা সঠিক হবে না। ছড়ার চেয়ে ছোটোদের কবিতাই এখন বেশি লেখা হয়। সুকুমার রায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য সমাজ জীবনকে ছড়া সাহিত্যে ধরেছেন, লিখেছেন ছোটোদের জন্য। গঠনগত শৈলী দু-ধরণের। যা পুরোটাই লেখক তার নিজস্ব শৈলী ও আঙ্গিক ঠিক করে লেখেন। অন্নদাশংকর রায় তাঁর ঘরে তেলের শিশি ভাঙতে দেখে— ভাঙাভাঙি দিয়ে দেশভাগটাকে কি সুন্দর ছড়ায় এনেছেন, যে ভাগ এখনো চলছে, দল ভাগ, সমাজ ভাগ, বেতন ভাগ, জাতি ভাগ। ভাগ মানেই পিছিয়ে পরা, ভাগ মানেই সংকীর্ণ যাপন। ভাগ মানেই ছন্দহীন দ্বন্দ্ব। এক জাতি এক প্রাণ, এক মাটি এক দেশ— এটা যখন আর থাকে না তখনই দেশ ও মানুষ দুর্বল হয়ে যায়। এতোসব বিষয়ও এখন ছড়ার বিষয়। তবে ঘুম পাড়ানী ছড়া, শিক্ষা ও নীতিমূলক ছড়া, প্রকৃতি নিয়ে ছড়া, দুঃখ সুখের ছড়া, হাস্যরসের ছড়া, ছোটোদের জন্য। কিশোরদের জন্য। সমাজ যখন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যায়, মানুষের মনের কূটবুদ্ধি, মেদ এবং ছলচাতুরী যখন বাড়তেই থাকে সরাসরি এ সংকটকে ধরতেই শব্দে ছন্দে অল্পকথায় সৃষ্টি হয়ে যায় বহু ছড়া। অনেকে একে রাজনৈতিক ছড়া বলেন। কোন সমস্যাকে তুলে ধরা মানে রাজনৈতিক নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং গোষ্ঠিকেন্দ্রিক যে ছড়া সেটা রাজনৈতিক হতে পারে, তবে রাজনৈতিক ছড়ার চেয়ে সমাজ ও সামগ্রিক অবস্থানকে যে ছড়ায় তুলে ধরা হয় সে ছড়াকে সময় আটকে রাখতে পারেনা।

এতোসব বলার পেছনে একটাই কারণ— আমাকে বলা হয়েছে অপরাজিতা রায়-এর ছড়া নিয়ে আমার পাঠ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য।

অপরাজিতা রায়-এর প্রথম বই 'বাইরে বাউল', ১৩৮৩ বাংলায় প্রথম প্রকাশ। প্রকাশক সুদীপ বর্ধন ও অর্ধেন্দু শেখর ভট্টাচার্য। লিনোকাট প্রচ্ছদ প্রশান্ত সেনগুপ্ত, মূল্য পাঁচ টাকা। তাঁর দ্বিতীয় ছড়ার বই 'ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা', অবলা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, প্রচ্ছদ বিমল কর, মূল্য পাঁচ টাকা। পরবর্তী অগ্রন্থিত কিছু ছড়া যেগুলো ছাপা হয়েছিল 'ঝিনুক', 'শিশুমহল' এবং অন্যান্য কাগজে। আর সবগুলো থেকে নির্বাচন করে 'নির্বাচিত ছড়া' নামে অপরাজিতা রায়-এর একটি বই বেরিয়েছে সৈকত থেকে। প্রচ্ছদ মধুমিতা আচার্য। দাম চল্লিশ টাকা। প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬ সাল।

সেই ৬০ থেকে ৭০ সাল বা তারও আগে । সবকিছু লেখার ফাঁকে লিখতেন দু'একটি পদ্য, ছড়া। চুনিদা' (চুনী দাশ) তাঁর ছড়া লেখার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন কলেজে পড়ার সময়ই তাঁর ছড়া লেখার হাতেখড়ি। ছড়া লিখে কলেজে নিয়ে পড়ে শোনাতেন শ্রীবাস ভট্টাচার্য মহাশয়কে। শ্রীবাস ভট্টাচার্য ছিলেন ডা. বিকাশ ভট্টাচার্য-এর ছোটো ভাই। দারুণ ছড়া লিখতেন এবং তাঁর ছড়া নাকি ছাপা হতো 'শুকতারা' ইত্যাদি কাগজে। তিনি ছড়ার সমজদারও ছিলেন খুব। B.Sc পাশ করার পর তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বাইরে চলে গিয়েছিলেন, আর আসেন নি। তেমনি রাজ আমলে অনঙ্গমোহিনী দেবী, গিরিজানাথ চক্রবর্তী, পরবর্তী সময় অজয় ভট্টাচার্য, রণেন্দ্রনাথ দেব, দক্ষিণা রঞ্জন চক্রবর্তী, প্রভাস চন্দ্র ধর কিছু পদ্য লিখেছেন। সত্তর থেকে চুনী দাশ পুরোদমে লিখতে শুরু করেন। তারপরই আমরা পেয়ে যাই অনিল সরকার, সুব্রত দেব, তিতাস চৌধুরী, অমূল্য সরকার, এবং তারওপরে ক্রমাগত আরো অনেককে এবং অপরাজিতা রায়কে।

'বাইরে বাউল'-এ মোট ছড়ার সংখ্যা ৫৪, তাঁর কথায়— 'দেখা আর বলা দুটোর ধরণ ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। চল্লিশ ঘন্টায় অভিজ্ঞতার যে ভীড়ের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হয় এখন, তার একটার সঙ্গে আরেকটার চেহারার এত অমিল যে, বোধের অবচেতন স্তরে নেমে গিয়েও সেগুলোর ঠোকাঠুকি থামে না। সেইসব অসঙ্গতির আওয়াজ বেরিয়ে আসার রাস্তা আজ খুঁজে পেয়েছে ছড়ার তির্যক ও সংক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে। ছড়া তাই আর ছেলেভুলানো নয়, পরিণত মনের সংহত প্রকাশ মাধ্যম'। এই সংহত প্রকাশ মাধ্যমের মধ্যেই শিল্পটা লুকিয়ে আছে। শ্রীমতী রায় সময়টা ধরে ধরেই ছড়া লিখেছেন। সেই সময় আগরতলা ধর্মনগর রাস্তাটা কেমন ছিল তারই দুটো অংশ—

'বড়মুড়ায়
হাড় গুঁড়ায়
বাসে।
আঠারমুড়া
মাথা ঘোরা
বমি।

একটা নামকে নিয়ে শব্দের খেলায় কিভাবে পরিবেশ পরিস্থিতির ছবি আঁকা যায়—

'চড়িলাম ক্রিয়াপদ
কে বলেছে, কী আপদ
চড়িলাম যাওয়া যায়
টি. এ বিল পাওয়া যায়।
ত্রিপুরায় চড়িলাম
ক্রিয়া নয়, শুধু নাম।'

যে লেখাটি দিয়ে 'বাইরে বাউল'-এর যাত্রা শুরু—

মিল না হলে ছড়া?
জল না হলে ঘড়া?
ফুল না হলে তোড়া?
শিল না হলে নোড়া?
চিল না হলে গুড়া?
খিল না হলে জোড়া?
হিল না হলে জুতো?
কিল না হলে গুঁতো?
থ্রিল না হলে ছবি?
দিল না হলে কবি?

তাইতো কবি হবেন একজন সুহৃদয়ের অধিকারী। কবি হবেন দিলদার। তিনি লিখলেন— জুলফি আঁটা রোমিওদের কথা। আবার আসাম পাঞ্জাবের অস্থিরতা ভাবতে ভাবতে তিনি লিখেন—

'ছুটির সময় কোথায় যাব
আসাম থেকে পাঞ্জাবে
সবাই যখন রণংদেহি
পাঞ্জা লড়ে জান যাবে'।

পাশাপাশি লিখলেন—

'শেষটায় তেষ্টায়
মরে গেল কেষ্টা
মরুভূমি পার হতে
করেছিল চেষ্টা।'

শব্দ ভেঙে একটু মজা করে বলেছেন —

'সবটা খুলে ক'
আছাড় খেয়ে ও
হাড়গোড় ভেঙ্গে দ'?
আমি শুনে থ'।
তাড়াতাড়ি চ।'

নিজেকে বলেছেন অথচ সেটাই চলে গেছে সর্বত্র—

'গল্প কবিতা
যখনই যা লিখি
অল্প বেশি তা
আসলে চালাকী।'

তিনি লিখেছেন কৈলাশহরের তৎসময়ের ভয়াবহ বন্যার কথা, মেলাঘর, রুদিজলার কথা—

'মুখোশ হল ফুটো
বোঝা গেল চেহারা তোর
একটা তো নয় দুটো।'

এ মুখ মুখোশের খেলা ছিল, এখনও চলছে। যেন মুখের ভেতর আরেকটা মুখ করছে খেলা—

'দুই ঠোঁটে
দিলে এঁটে
পাথুরে কুলুপ
দিয়ে বেশ
জিজ্ঞেস
কেন আছি চুপ।'

তেমনি মেয়েদের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে তিনি লিখলেন —

'মান্ধাতার আমলের
নিয়মের চাপ
এক চুল নড়ালেই
মেয়েদের পাপ।
ছেলেদের বেলাতে
সাতখুনও মাপ।'

তারও কি পরিবর্তন ঠিকঠাক ঘটেছে, এখনও ?

'যাদুঘরের মড়া
লিখতে গেল ছড়া

ছড়া লেখার শখ
মিল খুঁজতে ঘাম বেরুল
জল খেল ঢক ঢক।'

'সব্বাই কবি নয় কেউ কেউ কবি' তেমনি যা খুশি লিখলেই সেটা কি ছড়া হয়ে যায়? উপকারীর উপকার স্বীকার করা তো দূরের কথা উল্টো তাকেই আক্রমণ—তা নিয়ে—

'যার পাটা যার পুতা
তার পিঠেই মারেন গুঁতা
নইলে তিনি বাঁচেন না।'

রত্নাকর বাল্মীকি হলে একটু পরীক্ষা করে নেবার কথাই তিনি ছড়ায় বলতে চেয়েছেন—

'হয়ে গেল
বাল্মীকি
বাজিয়ে দেখ
জাল নাকি।'

অন্যত্র লিখেছেন—

'ভুল জেনেও
স্বপ্ন চাও
কুঁড়ি ফোটার।
খোঁড়া পায়ে
খোয়াবী এ
দূরে ছোটার।'

কিংবা—

'সোজা কথার নেই এখানে
কদর তো
সোজা কথার করিস তোরা
কদর্থ।'

তেমনি ভোট জোট নিয়ে সে সময় লিখেছিলেন—

'ঠক বাছতে গাঁ যে উজাড়
জমার ঘরে হয়রানি সার
এখন করি কী?
কাজ চলে না একলা হাতে
তাই বলে কি ঠকের সাথে
মানবো শরিকি?

সময়টা ছিল মোড়ে মোড়ে শহীদ বেদী আর মূর্তি স্থাপনের দিন। তারপর শ্রদ্ধার অভাব, যথাযোগ্য সম্মান কোথায়, এই ভাবনায় তাঁর দেখাকে তিন লাইনের ছড়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন—

শতবর্ষ পূর্তি
মোড়ের মাথায় মূর্তি
কাক শালিখের ফূর্তি।'

একসময় ডম্বুরের মাছ সরকারী লাইনে অল্প দামে বিক্রি হতো, সেটাও তাঁর চোখ এড়ায়নি—

'থলি নিয়ে দৌড়ই
যাই পাই রুই কই
লাইনেতে দাঁড়াবই
গিন্নীর বায়না।'

বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীল বলে যারা গর্বে আত্মহারা তাদের কথা ভেবেই লিখলেন—

মুরোদ কোথায়
কাজে ও কথায়
স্পষ্টই গড়মিল,

নিজেরাই তাই
নিজেদের বলি
দারুণ প্রগতিশীল।'

'বাইরে বাউল'-এর (৫৫নং) শেষ ছড়াটি—

'এক যে আছে হুলো বেড়াল
বেড়াল মানে মেকুর
মাছ খেয়ে সে দিব্যি তুলে
তুলসী পাতার ঢেঁকুর।
বাইরে বাউল একতারাতে
ভেতরে ধার চাকুর।'

অর্ডার মাফিক যারা কবিতা লিখেন, আর ছড়া কবিতা লেখাকে যারা বড্ড সহজ মনে করেন তাদের জন্যই হয়তো লিখেছেন 'ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা' বইটির ২নং ছড়াটি—

কবিতার কামলা
শ্যামলাল রায়
মুলি বাঁশে গুনা বেঁধে
কবিতা বানায়।
তেচালা বা চৌচালা

যে যে কাজ দিক
সাপ্লাই দিতে পারে
অর্ডার মাফিক।'

অন্যদিকে পুজোর কেনাকাটায় 'কর্তার ঘাড় কেটে/ গিন্নীর মার্কেটের কথা যেমন রয়েছে, তেমনি মানুষের দুঃখ দুর্দশা, আর্থিক ব্যবধান, উঁচু নিচু ভেদাভেদের যন্ত্রনার কথাও রয়েছে তাঁর ছড়ায়। এক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষাকেও তিনি তাঁর ছড়ায় সুন্দর ব্যবহার করেছেন।

'আকাশ ভাইঙ্গা ঢল নামে গো
রাজ্যে আইল বান
কোথায় রাখি কাঁথাকানি
কোথায় পোলাপান?'

অন্যদিকে একটু রসেবসের ছড়াও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে—

'মধু লোভে বধূ দেন
মৌচাকে ঢিল
পাজি মাছি তেড়ে আসে
ডেয়ার ডেভিল।'

এবং শেষ দু'লাইনে তিনি লিখেছেন—

'পেটে খেলে পিঠে সয়
দু-চারটে কিল।'

তাঁর রাগের বাঁধভাঙা প্রকাশ লক্ষ করা যায় 'ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা'-র ২১নং ছড়ায়। তাছাড়া শিশু কিশোরদের জন্য তাঁর কিছু ছড়া আমরা দেখতে পাই 'ঝিনুক', 'শিশুমহল' ইত্যাদি কাগজে। শতবর্ষে সুকুমার রায়কে নিয়ে—

'ছোট্ট বেলার
সঙ্গী খেলার
তোমার লেখা সব ছড়া
হাসির মেঘে
মুখটি ঢেকে
পালিয়ে যেত দুঃখরা।'

তেমনি বিদ্যাসাগর'কে শ্রদ্ধা জানাতে—

'ফুলের মত নরম আবার
বজ্রকঠিন বিদ্যাসাগর
সে আমাদের, সে আমাদের
আমাদেরই বিদ্যাসাগর।'

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ নিয়ে তাঁর যেমন ছড়া রয়েছে তেমনি পরিবেশ নিয়েও দু'তিনটি ছড়া আমরা পেয়েছি তাঁর কাছে—

'ধুলো ভরা রাস্তা
ধোঁয়া ছাড়ে বাসটা
ঢোকে সব ফুসফুসে
পরমায়ু নেয় শুষে।'

কিংবা—

'গাছ আমাদের বন্ধুরে
কাটিস না গাছ প্রাণ ধরে।'

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর থেকে পরিবেশ বিষয়ক একটি পুস্তিকায় পাওয়া যায়, যেমন লিখেছেন ঝিনুকেও। ভাষার সংকট নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি বাস্তবটাকে কি সুন্দর ছড়ায় মুড়ে দিয়েছেন—

'এ বি সি ডি এসে বলে
অ আ ক খ সব ভাই
তোমাদের জায়গায়
আমাদের ঘর চাই।'

পরাজয় যার সংবিধানে নেই, জয়ই যাঁর ধ্যান জ্ঞান, জয়ের জন্যেই লড়ে যান যিনি তিনিই অপরাজিতা, অপরাজিতা রায়। উনিশশ' সত্তরের শুরু থেকে আজ অব্দি যত ছড়া লিখেছেন— তা তাঁরই চোখে পড়া সমস্ত অসংগতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ছবি। তাঁর ছড়া সময়ের সাক্ষী। যা নতুন প্রজন্মকে অতীত ছুঁয়ে দেখার রসদ জোগাবে। আমি শুধু তাঁর ছড়ার অন্তরের কথাই কিছু বললাম, ছড়ার ছন্দ, লেখনশৈলী, শব্দ ব্যবহার, ইত্যাদি সমস্ত দিক নিয়ে পরবর্তী সময় হয়তো বিজ্ঞজনেরা আরো বিস্তারিত লিখবেন। তবে তাঁর ছড়ার একটা নিজস্ব ধরণ আছে, যার ফলে নাম না থাকলেও লেখা পড়েই বোঝা যায় এই ছড়াটি শ্রীমতী অপরাজিতা রায়-এর।